জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনায় 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি'র ধারণা

এ কে এম মাহবুবুল হক*

Abstract

Analysis, exploration and unveiling of the forms of Bangali culture is an important topic of Ahmad Sharif's essays. In his essays, he expresses his views on various aspects of theoretical research on culture. The views of the predecessors on Bangali culture have also been analyzed in these discussions. Ahmed Sharif thinks that religion- folklore- animism is one of the sources of culture; dynamism and creativity are important elements. He expects welfare and aesthetics, sense of modesty in a way of life within the culture. He considers the overall and collective development of the society as the goal of advanced culture. The fascination with tradition should be dispensable in the interest of the acceptance of culture; where as the inclusiveness and totality is the inspiration. Ahmed Sharif expressed his views by analyzing the origins and nature of Bangali culture. The purpose of this essay is to analyze in what way he has dealt with these thoughts. Ahmed Sharif has conceptualized his thought of 'Dwoitadwoito Samskriti' [Dual culture], which he coined first about Bangali culture. How the concept was established and how effective or significant it is in explaining Bangali culture has been analyzed in the present article.

"সংস্কৃতি' শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর'[১] –সংস্কৃতির একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞার্থ খুঁজতে গিয়ে আহমদ শরীফের এমন উপলব্ধি হয়েছিল যার মূল কারণ, বস্তুত, দ্রুত পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি-ধারণার মধ্যে; ক্রমাগত যা আরও জটিল, দূরর্থবহ এবং বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে। সংস্কৃতি অনেকগুলো স্বতন্ত্র জ্ঞানধারার আলোচ্য, এর গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে জটিল, এমনকি আলোচনাও কোনো একক বিষয়-শৃঙ্খলায় সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটা সায়মন ডুরিং বলেন– 'সংস্কৃতি-পাঠ নিজেই একটি পাঠ।'[২] এই সূত্র ধরে বলা যায়, আহমদ শরীফ-মনীষার একটা উল্লেখ্যযোগ্য প্রয়াস ছিল বাঙালির সংস্কৃতি অধ্যয়ন-অনুসন্ধান-উন্মোচন। বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে আহমদ শরীফের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা, উৎস, প্রেরণা, ক্ষেত্র, রূপ-রূপান্তর ইত্যাদি বিষয় এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। আহমদ শরীফ কোন চিন্তাসূত্রে ও কী প্রকারে এসব চিন্তার সাথে বোঝাপড়া করেছেন তা বিশ্লেষণ করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিপুল গবেষণায় তাঁর ব্যবহৃত অভিনব রূপকল্প 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি' ধারণাটি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা বাঙালির সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় কতখানি কার্যকর ও তাৎপর্যবহ সেটিও বর্তমান প্রবন্ধে বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, ক্ষিতিমোহন সেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতবিনিময়ের মাধ্যমে 'কালচার' [Culture] শব্দের বাংলা পরিভাষা 'সংস্কৃতি' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার আগে অন্তত তিনটি শব্দ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো– কৃষ্টি বা উৎকৃষ্টি, অনুশীলন এবং সভ্যতা। শব্দগুলির প্রতিটিই কোনো না কোনোদিক থেকে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ধারণ করে। কালচার শব্দের 'কাল্ট' [cult] যেমন ধর্মীয় কৃত্যাদি বা আচারকে বোঝায় তেমনি বাংলায়

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কৃষ্টি বা সংস্কৃতির শিকড় 'কৃ' কৃত্যকেই প্রকাশ করে। সংজ্ঞা নিরূপণের দুরূহতা উপলব্ধি করেও আহমদ শরীফ 'সংস্কৃতি'র একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা, যদিও একমাত্র বা চূড়ান্ত নয়, দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন–

> কোন দেশের বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেয়োচেতনাজাত পরিস্রুত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের প্রাত্যহিক বা সার্বক্ষণিক অভিব্যক্ত রূপই তার সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি গুণে মানে মাত্রায় স্থূলও হতে পারে কিংবা বহুপরিশীলনে মনন-মনীষার পরিমার্জনায় সূক্ষ্ম, সুন্দর, সুরুচি ও সৌজন্য জ্ঞাপকও হতে পারে। একটা কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র-শাস্ত্রিক সমাজ, দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতি কিংবা মতবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতির শ্রেষ্ঠগুণের, কর্মের ব্যবহার্য সামগ্রীর ও রুচির প্রকাশিত রূপই তার সংস্কৃতি।[৩]

১৯৯২ সালে কবি মতিউর রহমান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতামালায় 'সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রথম বক্তৃতায় এই সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন আহমদ শরীফ। এতে সংস্কৃতির তাত্ত্বিক বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়কে সমন্বিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, যেমন- শ্রেয়োচেতনা, রুচি, শ্রেষ্ঠ গুণ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা অতিক্রম করে দৈশিক-রাষ্ট্রিক-গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার মানুষের অভিব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া; যদিও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-ধারণা পুরোপুরি অপসৃত হয়নি। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সংস্কৃতি' (১৯৬৩)

প্রবন্ধে আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার সাথে উদ্ধৃত প্রবন্ধের চিন্তায় খানিকটা পরিশীলন লক্ষ করা যায়। তবে সংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের মূল প্রত্যয়সমূহ, যা বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচ্য, প্রায় অক্ষুণ্ণই পাওয়া যায়। উদ্ধৃত সংজ্ঞায় মানুষের কর্ম বা মানস উৎকর্ষকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তবে শ্রেণিচেতনাকে উপেক্ষা করা হয়নি। সংস্কৃতি বিষয়ে আহমদ শরীফের অপরাপর আলোচনার সাথে বিষয়টি পরীক্ষা করার আগে জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে সংস্কৃতিভাবনার বিবর্তনরেখা চিহ্নিত করা আবশ্যক।

ইউরোপের মধ্যযুগে সংস্কৃতি ছিল 'সভ্যতা'র প্রায়-সমার্থক, যেহেতু কৃষি ও পশুপালনই ছিল সমাজের উৎকর্ষ নির্ণয়কারী মানদণ্ড। সভ্যতাকে সংস্কৃতির সাথে অভিন্ন দেখার দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগ-উত্তর ইউরোপেও পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আধুনিককালেও অনেকে মানতে চান না যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ভিন্ন বিষয়।[৪] ইউরোপের শিল্পবিপ্লবোত্তরকালে, রোমান্টিক যুগে, ব্যক্তির মানসোৎকর্ষই হয়ে দাঁড়ায় সংস্কৃতির পরিচয়। এর সাথে যুক্ত হয় প্রযুক্তির ব্যবহার, বস্তুজগতের উপর মানুষের আধিপত্য, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি একান্ত নিত্যবিষয়াদি। ফলে সংস্কৃতি-ধারণার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়–– একদিকে ঐতিহ্য অন্যদিকে দৈনন্দিন বর্তমানের ভিন্নতা থেকে জন্ম নেয় লোক-সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতির ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারণার বিস্তারের মধ্যেই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় ম্যাথু আর্নল্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ *Culture and Anarchy* (১৮৬৯)– 'কালচার' শব্দের আধুনিকতার দিকে যাত্রা সেই থেকে শুরু; যদিও সংস্কৃতির পূর্বধারণা সমাজবিকাশের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ম্যাথু আর্নল্ডের ধারণার মধ্যেও প্রোথিত ছিল অভিজাত ও উচ্চবর্গীয় চেতনা। ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্বের অহং এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস নিষ্কণ্টক রাখার পুঁজিবাদী বুর্জোয়া চিন্তাচেতনার সাথে প্রথম সংঘাত তৈরি হয় প্রথম মহাসমর পরবর্তীকালে মার্কসবাদী সমাজভাবনা বিকশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তব্য সামনে আসার পর। সংস্কৃতির তাত্ত্বিক বিবর্তনে মার্কসবাদের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, উৎপাদনযন্ত্র ও আর্থিক ব্যবস্থাকে সংস্কৃতির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা। ১৯৫৭ সালে রিচার্ড হোগার্টের *The Uses of Literacy* ও ১৯৫৮ সালে রেমন্ড উইলিয়ামসের *Culture and Scociety ১৭৮০-১৯৫০* প্রকাশিত হওয়ার পর পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির ধারণায় বিবর্তন ঘটে যায়। ম্যাথু আর্নল্ড, টি এস এলিয়ট, এফ আর লেভিস প্রমুখ সংস্কৃতি তাত্ত্বিকদের অভিজাত শ্রেণিচেতনা এবং সৌন্দর্য-উৎকর্ষ-নান্দনিকতা-সমঝদারিত্ব ও জ্যোতি গুণান্বিত সংস্কৃতিধারণার পরিবর্তে রেমন্ড উইলিয়ামস, এডওয়ার্ড থম্পসন, রিচার্ড হোগার্ট, স্টুয়ার্ট হল প্রমুখ তাত্ত্বিকদের সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজের অসমতা ও বৈষম্য ব্যাখ্যা করার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়। নৃতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ক্রোয়েবার এবং ক্লাইডি ক্লাখন ১৯৫২ সালে সংস্কৃতির ১৬৪ প্রকার সংজ্ঞা[৫] সংকলিত করেন যার অধিকাংশই ছিল নৃতত্ত্ববিদদের দেয়া। তবে এরপরও সংস্কৃতি-ধারণায় গ্রহণ-বর্জন অব্যহত আছে। সংস্কৃতি কেবল বস্তুগত, প্রাযুক্তিক ও সমাজকাঠামোর বিষয় নয়, অর্থনৈতিক বা ক্ষমতাকাঠামোর অন্তঃশক্তির বশবর্তী নয়, শুধু জীবনযাপন পদ্ধতিও নয়–– একইসাথে অবস্তুগত মানসোপাদান বিশ্বাস-মূল্যবোধ-প্রতীক-আদর্শ দ্বারা নির্ণীত এক স্বাধীন রূপকল্প। একালের ধারণায় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ বা আভিজাত্যের কোনো স্থান নেই। উল্লেখ আবশ্যক যে, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হাত ধরে ভারতবর্ষেও আর্নল্ড-লেভিস-এলিয়টীয় চিন্তাভাবনাই বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সনাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে সেই বীজ এমনিতেই ছিল–– হিন্দু সমাজের 'শূদ্র' এবং মুসলমান হলে 'আতরাফ' সুস্পষ্ট পার্থক্যে ছিল 'আশরাফ' বা 'ভদ্র' লোক বলে কথিত সম্প্রদায় থেকে। ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা প্রভাবিত পণ্ডিতবর্গ অভিজাত ও উচ্চবর্গীয় চেতনাকে উন্নত সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। এই চিন্তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন ও মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার প্রভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সার্বজনীন সংস্কৃতির ধারণা ভারতবর্ষে পল্লবিত হতে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ বহুমতপথে বিভাজিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতির এক ভিন্ন রূপ পরিস্ফূটিত হয়। সমন্বয়মুখিতা এই সংস্কৃতির প্রাণ। বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিষ্ট পাঠক-গবেষক আহমদ শরীফ এই সমন্বয়ধর্মিতাকে তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

১.

আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনা গড়ে উঠেছে– (ক) প্রীতি ও সৌন্দর্যানুভূতি (খ) আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ (গ) শ্রেয়োবোধ ও কল্যাণচেতনা (ঘ) সহিষ্ণুতা ও উদারতার ওপর ভিত্তি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদী দর্শনের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবাঞ্ছা ও মানবহিতৈষণার পথ ধরে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন রেনেসাঁবাহিত উদার-মানবতাবাদী জীবনদর্শনে কিন্তু শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রেই তিনি স্থিত হয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি পুরোপুরি বস্তুবাদী হয়ে ওঠেন, তাঁর সংস্কৃতিচিন্তাতেও আশ্রিত হয় যুক্তি ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। 'যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি' নামক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–'চিন্তাচেতনায় যুক্তির, জ্ঞানে বিজ্ঞানের তথ্যের এবং জীবিকায় প্রযুক্তির আনুগত্য অঙ্গীকার না করলে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারেন না।'[৬] এ সময় আহমদ শরীফ নাস্তিক্যের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লে তাঁর সংস্কৃতিভাবনাতেও তা প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতিবান এবং নাস্তিক হয়ে ওঠে সমার্থক। তদুপরি সুজনোচিত মৌল-গুণাবলির ওপর তাঁর আস্থা অটুট ছিল। কারণ তিনি বলতেন, 'সৌজন্যই সংস্কৃতি' আর সৌজন্যের ধারকই সুজন হয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে রচিত

বিচিত-চিন্তা (১৯৬৮), *সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *জীবনে-সমাজে-সহিত্যে* (১৯৭০) গ্রন্থে তাঁর সংস্কৃতিভাবনা তত্ত্ব ও দার্শনিক প্রজ্ঞানির্ভর; পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঘন ঘন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় আহমদ শরীফের মননে-চিন্তায়ও পরিবর্তন সূচিত হয়, তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় বুর্জোয়া আভিজাত্য ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সাথে মার্কসীয় বৈশ্বিক ও সর্বমানবিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে।।

আহমদ শরীফের মতে, সংস্কৃতিবান সৌন্দর্যানুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন মানুষ হওয়া আবশ্যক। নিজে সুন্দর হওয়া এবং চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর করার সাধনাই সংস্কৃতিবানের সাধনা। সুন্দরের সাধনার বলেই একজন প্রকৃত ধার্মিক, সংস্কৃতিবান ও সুনাগরিক একই লক্ষ্য এবং মর্যাদার মোহনায় মিলিত হন। 'বিকাশের পথে মানবতা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বক্তব্যের[৭] উদ্ধৃতি–

> মনুষ্যত্ব বা সৌন্দর্যবোধ অর্জনে চেষ্টা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস বা সাধনা বা সৌন্দর্যানুভূতিই হচ্ছে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি-সাধনা। সুরুচি বল, সংস্কৃতি বল সবকিছুরই প্রেরণা আসে সৌন্দর্য-পিপাসা থেকে এবং এ সবকিছুই সৌন্দর্য-উপাসনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দরকে নিজের মধ্যে পাওয়া। দেহে-মনে, বুকে-মুখে সুন্দর হওয়াই হচ্ছে সংস্কৃতি সাধনার চরম ফল– পরম পরিণতি। এ ফল প্রাপ্তি ঘটলেই একজন মানুষ হয় যথার্থই ভদ্রলোক তথা সুনাগরিক, হয় ধার্মিক। কেননা মর্যাদাবোধই ভদ্রলোকের প্রধান বৃত্তি বা guiding force।
>
> সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রথম ফল আত্মমর্যাদাবোধের উন্মেষ বা জাগরণ। যার মর্যাদাবোধ আছে, কোনো অন্যায়-অপকর্ম করতে পারে না সে। অন্যায়-অপকর্ম হচ্ছে সৌন্দর্যবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সংহারক। এটিই সমাজে নিন্দনীয়, ধর্মে পাপ আর রাষ্ট্রে অপরাধ। এ-ই হচ্ছে একশব্দে দোষ– যা জ্ঞানের বৈরী, যা মনুষ্যত্ব, তথা সৌন্দর্য-সাধনার পথে প্রবলতর বাধা।... ... কাজেই দেশ, ধর্ম ও রাষ্ট্র মানুষের জীবন-সাধনায় উপায় বা উপলক্ষ মাত্র– আদর্শ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়।[৮]

সংস্কৃতিবান মানুষ হবে স্বতন্ত্র; তবে সেই স্বাতন্ত্র্য, মতানৈক্য বা আচার পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না; আত্মোৎকর্ষের ভিত্তিতে অর্জিত ও রক্ষিত হয়। 'স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> সংস্কৃতিচর্চার পূর্ব-শর্ত হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন। যার মর্যাদাবোধ আছে, সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। সংস্কৃতির প্রথম পাঠ সহিষ্ণুতা ও উদারতা। রুচিবান মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণার শিকার হতে চায় না। তার মধ্যে থাকবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, সে-স্বাতন্ত্র্য অর্জিত ও রক্ষিত হবে আত্মোৎকর্ষের ভিত্তিতে।[৯]

সংস্কৃতিবানের স্বাতন্ত্র্য অনন্যতার নামান্তর। অপরের কল্যাণচিন্তা, অর্থাৎ `To know all is to pardon all' তার উপলব্ধ সত্যসার; `Live and let live' বা 'নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও' অর্থাৎ কল্যাণবাঞ্ছার মধ্য দিয়ে শ্রেণির সহ-অবস্থানতত্ত্ব তার জীবনের নিয়ামক; 'নিজে ভালো হও, আর অপরের ভালো চাও, ভালো করো'– আদর্শ তার জীবনের দিশারী।[১০] তবে আহমদ শরীফের প্রত্যয় : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই, সংস্কৃতির কোন স্থায়ী রূপ থাকতেই পারে না।[১১]

সংস্কৃতি কোন বদ্ধ, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ চর্চা বা চর্যা নয়।[১২] এটি প্রবহমন, পরিবর্তনীয়। সংস্কার হয় বলেই তা সংস্কৃতি; না হলে হতো কুসংস্কার। জীবনের জন্য যা অবশ্য বর্জনীয়। আহমদ শরীফ

বহমান, প্রাণময় ও বিকাশমান সংস্কৃতিকে লালন করতে চান বলেই সাংস্কৃতিক শুচিতার কথা অবান্তর মনে করেন, 'দেশ, জাত ও ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> সাংস্কৃতিক শুচিতার কথামাত্রই অবান্তর। কেননা সংস্কৃতি বদ্ধকূপের জীয়ল মাছ নয়। সংস্কৃতি বহতা নদীর স্রোত। প্রতিদিনের সূর্যের সঙ্গে তাল ঠুকে চলার নামই সংস্কৃতিপরায়ণতা। তাই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না, গ্রহণে-সৃজনেই তার স্থিতি ও বহমানতা। বিকাশমানতাই সংস্কৃতি। সুন্দর ও কল্যাণকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করা, উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা, জীবনে গ্রহণ করা ও ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতি। যে সৃজন করতে পারে না, গ্রহণ করেই তাকে সংস্কৃতি চালু রাখতে হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুচিবাই সংস্কৃতিবিমুখতার অন্য নাম। সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণবুদ্ধি, সৃজনশীলতা অন্তত গ্রহণশীলতা সংস্কৃতিপরায়ণতার লক্ষণ।[১৩]

সংস্কৃতি, আহমদ শরীফের মতে, সমবায়ী চিন্তার ফল নয়। সমষ্টি নয়, ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। ব্যক্তি থেকেই তা সমাজের অনুসৃত হয়। তাই পরিশ্রুত জীবনচেতনা এবং সংস্কৃতির সহাবস্থান দেখি আমরা। 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তিনি এই চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> [সংস্কৃতি] জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে, কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তিমনের। কেননা সংস্কৃতিও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন পঁষঃৎব হয় সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে।[১৪]

আহমদ শরীফের মতে, সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান উৎস ঈশ্বরপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, আচার-আচরণ এবং পালা পার্বণ। সর্বপ্রাণবাদের উৎস ভয়-বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান-ক্ষতিভীতি-প্রাপ্তিলিপ্সা ইত্যাদি সংস্কৃতিরও আদি উৎস।[১৫] তবে নিরীশ্বরবাদীর জন্য লোকাচার-দেশাচারই সংস্কৃতির উৎস এবং সবক্ষেত্রেই সৃজনশীলতাই সংস্কৃতির নিয়ামক; সংস্কৃতিবানের ব্যক্তিত্বের জন্য উপযোগী হলো সর্বক্ষণ নতুন হয়ে ওঠার সাধনা। নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সমর্থনে আহমদ শরীফও মনে করেন মানুষের অর্জিত আচরণ হলো সভ্যতা, যা আত্মশক্তির উন্মেষ-বিকাশ-প্রয়োগের ফল–– সুতরাং সংস্কৃতিরও উৎস।[১৬]

সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য-অন্বেষা, মনুষ্যত্ব ও অনুভববেদ্য মনোবৃত্তি। অসুন্দর ও অকল্যাণকে বর্জন করে জীবনকে সংস্কৃতিবান করে তুলতে হয় বলেই সংস্কৃতিবান জীবনের রূপদক্ষ শিল্পী। শুধু প্রয়োজন আর উপযোগ-চর্চা জীবনকে অর্থহীন করে। তাই মানুষ কেবল উপযোগ সৃষ্টিতেই তুষ্ট থাকে না, জীবনকে অর্থপূর্ণ করার দিকে মনোযোগী হয়। যেখানে প্রয়োজনের শেষ, সৌন্দর্যের শুরু সেখান থেকেই। সুতরাং ' যা কিছু বাহ্যত প্রয়োজনাতিরিক্ত কেবল মনের ও চোখের সৌন্দর্য তৃষ্ণা মেটানোর লক্ষ্যে শোভা বৃদ্ধির প্রয়াস প্রসূন, তা-ই সংস্কৃতি।'[১৭] ক্রমাগত জীবনের নতুন তাৎপর্য সন্ধানে মানুষ ব্যাপৃত হয় বলেই, সৌন্দর্য-পিপাসার শেষ নেই। এই পিপাসাই মানুষকে এগিয়ে নিচ্ছে জীবন-বিকাশের নতুন নতুন দিগন্তে–শ্রেয়সের সন্ধানে। পুরাতনে অস্বস্তি ও অবজ্ঞা না জাগলে নতুনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস জাগে না। মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই পিপাসা, অন্বেষা ও প্রয়াসের ফল। আহমদ শরীফের মতে–

> মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনধর্মী ও গতিশীল। এজন্যে সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হতে পারে না। অনুকারক অনুসারকের গতানুগতিক ধারার সংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতি নয়–আচার। কেননা স্থিতিশীল সংস্কৃতি প্রাণের প্রেরণাহীন ও তাৎপর্য-বর্জিত আচারে কিংবা সংস্কারে অবসিত হয়।

> যেমন জাকাত দানের মূলে দুঃস্থ মানবপ্রীতি, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং সংবেদনশীল ব্যাকুল হৃদয়ের যে মানবিক প্রেরণা ছিল, তা আজ অবলুপ্ত। ফলে তা আজ একটি অনভিপ্রেত ধর্মীয় কর্তব্য–একটি যান্ত্রিক আচার মাত্র।[১৮]

দেশ-ধর্ম-ভাষা-জাতীয়তা কোনোকিছুই এককভাবে সংস্কৃতির জন্য নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক হতে পারে না– এটিও আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর এই চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়ে *স্বদেশ অন্বেষা* গ্রন্থের 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> ধর্মমতের অভিন্নতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতিই থাকত। কেবল ভাষাই যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হত, তাহলে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিই থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমানির্ভর হত, তাহলে ভৌগলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এতদিনে সারাবিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত।[১৯]

সংস্কৃতি এক সমন্বিত, সুষম, সুজনোচিত জীবনাচার ও জীবনবোধ। জ্ঞান এবং পরিচর্যার মাধ্যমে এটি বিকশিত ও বিভূষিত হয়– এককভাবে কোনো ধর্ম-ভাষা-রাষ্ট্র-বিধিব্যবস্থা দ্বারা সংস্কৃতি সৃষ্ট বা গঠিত হয় না। আবার নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ওপর ভৌগোলিক, জলবায়ুগত ও প্রাতিবেশিক প্রভাবকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন তিনি। সুতরাং বলা যায়, আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনা বস্তুগত ও প্রত্যক্ষ উপাদান এবং ভাবসম্পৃক্ত, অবস্তুগত ধারণা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য, 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতির দুটি রূপের উল্লেখ করেছেন–– ক. মানসসংস্কৃতি যা মানসিক বা মানবিক অনুভব-উপলব্ধির সূক্ষ্ম উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির রূপ। যেমন সুরুচি-সৌন্দর্যচেতনা। এবং খ. ব্যবহারিক সংস্কৃতি যা প্রাত্যহিক জীবন যাপন সম্পৃক্ত। যেমন– গৃহনির্মাণ, রান্না, আসবাব, বস্ত্রনির্মাণ ইত্যাদি। 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা' প্রবন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টির মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়–

> যে-কোনো মানুষের সংস্কৃতিতে কিছু ধর্মীয় আচারের রঙ, কিছু দেশের জলবায়ুর প্রভাব, কিছু ভাষার রস, কিছু প্রয়োজনের রেশ, কিছু শিক্ষার ফল, কিছু সম্পদের ছাপ, কিছু জ্ঞানের লাবণ্য, কিছু বিদ্যার দান, কিছু হৃদয়বৃত্তির প্রসূন, কিছু মননের মসৃণতা, কিছু প্রজ্ঞার দীপ্তি, কিছু মানবিকতার মাধুর্য, কিছু কল্যাণ-চিন্তার স্নিগ্ধতা থাকেই। সবকিছুর সমন্বয়ে সংস্কৃতি মানুষকে সৃজন করে। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। সুজন মাত্রেই মনুষ্যত্বসম্পন্ন। কাজেই সৌজন্যের অপর নাম পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। অতএব সংস্কৃতি মানবতারই নামান্তর। একজন মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষই কেবল সুজন ও সুনাগরিক হতে পারে। এমন মানুষ অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণের শত্রু। একজন জীবনসচেতন সত্যসন্ধ সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ তার মানবিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলা করে না।[২০]

এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক গোপাল হালদারের বক্তব্যও তুলনীয়। তাঁর মতে, সংস্কৃতির মূল ভিত্তি জীবনসংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means) প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure) এবং শেষ পরিচয় মানসসম্পদ যা সমাজসৌধের শিখরচূড়া বা উপরতলার উপকরণ (super structure)। তাঁর ভাষায়–

সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধ সত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়–– এইটিই আসল কথা।[২১]

আহমদ শরীফের মতে, উন্নত সংস্কৃতি বলতে বোঝায় দেশ-ধর্ম-জাতি-ভাষা নির্বিশেষে শ্রেয়োস্কর ও প্রেয়োতর অংশের মিশ্রণ বা আত্মীকরণ। প্রাগ্রসরতা, প্রবহমানতা ও গতিশীলতাই সংস্কৃতিমানতা। এই শ্রেয়তার সন্ধান করতে গিয়ে আহমদ শরীফ কয়েকটি লক্ষণও চিহ্নিত করেন–

> আচরণে সুরুচিও সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত সৌজন্য, নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্রে উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণচেতনার ব্যঞ্জনা কথায় সৌজন্যের আভা, সজ্জায় সৌন্দর্য, আলাপে আন্তরিকতার ও বিনয়ের মাধুর্য, চোখে প্রীতিপ্রসন্নতার প্রভা এবং জীবনাচারে সম ও সহ স্বার্থে স্বাধিকারে সংযমের সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের প্রয়োজনীয় গুণের বা প্রত্যাশিত আচার-আচরণের বা ব্যবহার নীতিরীতির অনুশীলনে ও প্রয়োগে আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।[২২]

সংস্কৃতিবান হলে মানুষ হয় সংবেদনশীল, পরিণামদর্শী। কিন্তু একা সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। 'সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেই কেবল নিজের প্রতি নয়, প্রতিবেশীর প্রতিও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে।'[২৩] এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে তৈরি করে প্রতিবেশীদের সুষ্ঠু জীবনের ভিত। চরিত্রবল, মুক্তবুদ্ধি এবং উদারতার ঐশ্বর্যই এমন মানুষের সম্বল ও সম্পদ। বেদনামুক্তি এবং আনন্দ-অন্বেষাই সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনসত্য। দেখা যায় আহমদ শরীফ অনেকাংশে আধুনিক সংস্কৃতিচিন্তাকেই ধারণ করেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসাও গড়ে উঠেছিল ম্যাথু আর্নল্ড, লেভিসের রেনেসাঁবাহিত উৎকর্ষ-আভিজাত্য-নান্দনিকতা-ব্যক্তিমানসকেন্দ্রিক সংস্কৃতিধারণা থেকে। ঔপনিবেশিক প্রতিপত্তি-আধিপত্য দ্বারা তিনিও নিয়ন্ত্রিত ছিলেন কিন্তু তাঁর পরীক্ষাপ্রিয়, সমাজবাদী মনীষা কখনও স্থিত থাকেনি সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো প্রথাগত ধারণায়। তাই ঐতিহ্য-মুগ্ধতাকে বরাবরই তিনি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বলে মনে করতেন। গতিশীলতা, সার্বজনীনতা, স্বনির্ভরতা এবং বস্তুজগতের সাথে আর্থিক ও মানসিক কর্ষণে অর্জিত মানসসম্পদ আধুনিক সংস্কৃতির রূপরেখা। আহমদ শরীফ এর মধ্যেই ছিলেন আস্থাশীল।

২.

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্য আহমদ শরীফের গবেষণার সবচেয়ে বিস্তৃত অঞ্চল। আহমদ শরীফ সৃজনশীলতাকেই সংস্কৃতি বলে গুরুত্ব দিলেও বাঙালি সংস্কৃতি বিকশিত হওয়ার জন্য গ্রহণশীলতাকে বড় শক্তি হিসেবেই দেখেছেন। তাঁর মতে, সৃজনশীলতা নয়, বাঙালির সাংস্কৃতিক অনন্যতা গ্রহণ ও আত্মস্থ করার শক্তির মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন, গ্রহণশীলতা ও আত্মীকরণ বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম মানসসম্পদ। এই সংস্কৃতি যে 'ইউরোপ থেকে আমদানি করা ধ্যানধারণা'[২৪] নয় তা নীহাররঞ্জন রায় অনেক আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। আহমদ শরীফ লিখেছেন এই সংস্কৃতি 'গ্রহণশীল ও অনুকারক'–

> সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই, নইলে সংস্কৃতি চালু রাখা যায় না। এজন্যে কোনো দেশের বা জাতির সংস্কৃতি কখনো অমিশ্র বা মৌলিক থাকে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাঙ্গীকরণ বা আত্মস্থ করাই হচ্ছে সাধ্য। যারা সৃজনে সমর্থ নয়, অথচ গ্রহণবিমুখ–যেমন পার্বত্য ও আরণ্যক মানুষেরা–তাদের মন-মনন ও সমাজ স্থাণু।
>
> কেননা সংস্কৃতিপরায়ণতার অন্য নাম গতিশীলতা। ক্রমোৎকর্ষ ও উন্নয়নই এর ধর্ম। আমরা–বাঙালিরা সংস্কৃতিবান হয়েছি, এগিয়ে চলেছি–সৃজন করে নয়, গ্রহণ করেই।[২৫]

বাঙালির সংস্কৃতির আরেকটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য একাত্মকরণ, যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে গ্রহণ শুধু নয় নিজের মতো করে আত্মস্থ করার ক্ষমতাও দিয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে বাঙালির সংস্কৃতি। আহমদ শরীফের মতে, কোনো নতুন বা উন্নত সংস্কৃতি সৃজনের ইতিহাস নেই বাঙালির কিন্তু রয়েছে প্রমাণিত পরিগ্রহণশীলতা। 'দুর্দিন' প্রবন্ধে বাঙালির গ্রহণশীল সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> পাঁচ রকমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের জাতি। পাঁচ মিশেলি হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাহলে কোন্ অর্থে আমরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলি? আমরা গ্রহণ করি, আর নিজের মতো করে নিই, যার নাম স্বাঙ্গীকরণ। এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের রূপ আর জাতীয় স্বরূপ।[২৬]

সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিবান হওয়ার অন্যতম উপায় পরিগ্রহণশীলতা। কোনো সমাজের পক্ষেই ব্যবহারিক ও মানসজীবনে সর্বত-সৃজনশীল হওয়া অসম্ভব, তাই সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। বাঙালির সংস্কৃতিকে 'গ্রহণশীল ও অনুকারক' বলে আখ্যা দিয়েছেন আহমদ শরীফ। সমন্বিতকরণ ও স্বাঙ্গীকরণ বা আত্মীকরণ বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাঙালি সংস্কৃতির এই সমন্বয়ধর্মিতার কথা আহমদ শরীফ বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি'। এই রূপকল্প সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা, কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সুনিশ্চিতভাবেই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী– একটি তার হার্দ্যিক ও মননজাত অপরটি প্রাতিবেশিক ও সত্তা-উদ্ভূত। একই সংস্কৃতি-দেহে দুই সত্তার এই মিলনই সংস্কৃতির দ্বৈতাদ্বৈত। সংস্কৃতির দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একের সংহতির মধ্যে বহুর বিকাশ সাধনের তত্ত্ব। আহমদ শরীফের ভাষায়––

> সংস্কৃতি একাধারে যেমন দেশ-কাল-জাত ধর্ম-নিরপেক্ষ [কেননা, সৌন্দর্যে, কল্যাণে ও মানবতায় দেশ-কাল-জাত-ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত নয়], তেমনি দৈশিক-কালিক-জাতিক, ধার্মিক ও বৈষয়িক আভরণও থাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংস্কৃতিতে লগ্ন। কেননা মানুষের প্রয়াস দেশগত ও প্রয়োজনগত চেতনার অনুগত। কাজেই মানুষের সংস্কৃতি একই লক্ষ্যে অনুশীলিত বলেই তা যেমন সর্বমানবিক; আবার দেশ, কাল ও প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকার করে বলে তা তেমনি ব্যক্তিক, সামাজিক, আঞ্চলিক আর ধার্মিকও বটে। সংস্কৃতিতে আমরা তাই বহুতে একের সংহতি, একেতে বহুর বিকাশ লক্ষ্য করি।[২৭]

বাঙালির সংস্কৃতির এই বিশেষত্বকে প্রীতি ও প্রেমের মেলবন্ধন, সমন্বয়মুখিতা ইত্যাদি নানা শব্দবন্ধে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতগণ। প্রসঙ্গত এক জনের অভিমত তুলে ধরা হল–

> বঙ্গে একটা বৈশিষ্ট্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশিমাত্রায় পরিস্ফুটিত হয়–– সেটা সমন্বয়মুখিতা। এই সমন্বয়মুখিতার কাছে অনেক দ্বন্দ্ব ও ভিন্নতা ধারালো থাকে না। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে ও সংস্কৃত জীবনাচরণের বিপক্ষে বঙ্গের নিম্নবর্গীয় ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে বার বার। কিন্তু

> তারপরেও উচ্চ-নিম্ন দ্বন্দ্বপূর্ণ, অমিত্র ও অ-মিশ্রিত অবস্থায় নিয়েই একটি সমন্বয়মুখী বাঙালি সত্তা গড়ে উঠেছে এবং এক সংস্কৃতিতে এসে মিলেছে।[২৮]

সর্বমানবিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হলে বহুকে যেমন ধারণ করতে হয় তেমনি প্রয়োজনের প্রভাবে হতে হয় একত্বের সংহতিসম্পন্ন। বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের যাবতীয় ভাবনাকে সূত্রাবদ্ধ করা যায় 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি' নামে। বৈদিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি যা সুফিতত্ত্বের প্রেমভাব দ্বারা জারিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলায় অভূতপূর্ব ভাবান্দোলন সৃষ্টি করেছিল। দেহ ও আত্মার অভিন্নতাসূত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভেদ কল্পনাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সারকথা। অর্থাৎ প্রেমভাবে একের মধ্যে দুইয়ের বিলীন হয়ে যাওয়ার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। আহমদ শরীফ বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যসূত্র নির্ণয় করতে দ্বৈতাদ্বৈত শব্দটি প্রয়োগ করেছেন মুখ্যত বাঙালি সংস্কৃতির প্রেম ও সমন্বয়ধর্মিতাকে বোঝাতে। বাঙালি-সংস্কৃতিকে একটি রূপকল্পে প্রকাশ করতে এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি' শব্দটি তাৎপর্যবহ–– দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই। পূর্বে উল্লেখিত আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার চারটি উপাদান বা ভিত্তি তাঁর দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতিরই ভিত্তি।

সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এ সম্পর্কে বর্তমানের সব পণ্ডিত যেমন একমত তেমনি সংস্কৃতির রূপান্তরের কারণ নিয়েও বহু মতে বিভক্ত। রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম-বর্ণ-দ্বন্দ্ব-বিবর্তন-আবর্তন এমন অনেক উপাদান-পদ্ধতি-যুক্তিদ্বারা সংস্কৃতির রূপান্তরকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই পথ ধরেই বাঙালির সংস্কৃতিতে বহুত্বের উপস্থিতি ও আত্মীকরণ-ক্ষম ঐতিহ্যের সন্ধান দিয়েছেন আহমদ শরীফ, তাঁর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে বিপুল গবেষণা ও বিশ্লেষণে এই আত্মীকরণের বহু উদাহরণও সংযোজিত হয়েছে। বাঙালির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যবহৃত 'বৈতসী', অর্থাৎ যা বেতের মতো নমনীয় অথচ সতত ঋজু, শব্দটি আহমদ শরীফের পছন্দ হয়েছিল এবং তিনি সেটি ব্যবহারও করেছেন। তবে দ্বৈতাদ্বৈত ও বৈতসীস্বভাব ভিন্নধর্মী রূপকল্প, প্রথমটি অন্তর্গত সমন্বয়ধর্মিতা, আরেকটি বাইরের ঋজুতা।

গ্রহণ-বর্জন-আত্মীকরণ সমাজে চলতে থাকে। ফলে সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পরিবর্তনকে অপসংস্কৃতি বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। অপসংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের মত কিছুটা ভিন্ন। 'সংস্কৃতি সম্বন্ধে' প্রবন্ধে অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> যা কিছু সমকালীন চেতনা-বিস্তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের এবং যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিকূল তা-ই অপসংস্কৃতি।[২৯]

তবে, বিদেশাগত যে-কোনো আচরণ-অভ্যাসই অপসংস্কৃতি মানতে সম্মত নন তিনি। 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' প্রবন্ধেও তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, অনভ্যস্ততার কারণে সাময়িকভাবে বিদেশি সংস্কৃতিকে খারাপ মনে হতে পারে, কিন্তু নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা চাই–

দেশকালের প্রতিবেশে যন্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ন্ত্রিত জীবিকাপদ্ধতির ও জীবিকাক্ষেত্রের চাহিদা অনুগ জীবনাচার উদ্ভাবন ও গ্রহণই হচ্ছে সংস্কৃতির বিকাশমানতার ও প্রবহমানতার প্রমাণ। গতিশীল

সংস্কৃতিই জীবনের চলমানতার সাক্ষ্য। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তার আর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে সংস্কৃতির স্বাস্থ্য সহজে বিকৃতি পায় না, পাবে না।[৩০]

হাতিয়ারের উৎকর্ষের ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্পর্কিত বলেই প্রতীচ্য সংস্কৃতি প্রাগ্রসরতায় নতুনত্বে শ্রেয়োচেতনায় জীবনমুখী ও সদ্বুদ্ধিজাত। আমাদের অনভ্যস্ত আকস্মিক দৃষ্টিতে তা অপসংস্কৃতি। কিন্তু বিদেশি সংস্কৃতি মাত্রই অপসংস্কৃতি নয়, আহমদ শরীফের মতে এই শ্রেণিকরণ আপেক্ষিক। সংস্কৃতি চলমান, গতিশীল এবং প্রতিমুহূর্তে বিকাশমান। ফলে নতুনকে বরণ করে নেয়ার মানসিকতাই সংস্কৃতিমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

সংস্কৃতিকে বটবৃক্ষের মত 'সারাজীবন বর্ধিষ্ণু ও বিকাশপ্রবণ' উল্লেখ করে আহমদ শরীফ আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই সংস্কৃতির উৎকর্ষ নিহিত বলে মন্তব্য করেছে।[৩১] তিনি 'লোকসংস্কৃতি'র নামে অনক্ষর পূর্বপুরুষের জীবনাচারকে বাঙালির সংস্কৃতি হিসেবে প্রমাণ করার শহুরে অপচেষ্টার ঘোর বিরোধী। তাই আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার অন্যতম প্রতিপাদ্য– অতীতমুখীনতা বা ঐতিহ্য সংস্কৃতি নয়, 'এ কালের অবদানই হবে আমাদের বড়াইয়ের গৌরব-গর্বের বিষয়।'[৩২] যেহেতু মানুষের জীবন সময় ও পরিপার্শ্ব সাথে নিয়ে চলে। তাই সুন্দর ও কল্যাণ সাধনার সঙ্গে মানুষের জীবিকার্জনের সাধনাও চলতে থাকে। প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরই কেবল সৌন্দর্যচেতনার উদ্ভব হতে পারে, যেমনভাবে, কথা যেখানে শেষ সেখান থেকে সুরের শুরু। তাই উত্তরকালে আহমদ শরীফের ভাবনায় গণমানবের সংস্কৃতির কথা বারবার এসেছে। যেমন, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশ্রুত মন্তব্য 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম' উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন–

> কাজেই সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্র আছে, যেমন সাহিত্যেও প্রতিফলিত রয়েছে শ্রেণীচরিত্র বা চেতনা, আর লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য তো আমরা সার্বক্ষণিক উচ্চারণে প্রকাশ ও প্রচার করি। অশিক্ষিত গেঁয়ো হলেই 'লোক' ভড়ষশ আর শিক্ষিত শহুরে হলেই তথা বিদ্যা-রুচি-বুদ্ধি-সংস্কৃতি যা-ই থাক, সাফকাপুড়ে হলেই 'মানুষ' হয়।[৩৩]

৩.

আহমদ শরীফ সংস্কৃতির শ্রেণিচরিত্র স্বীকার করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর মত উনিশ শতকীয় অভিজাত-সংস্কৃতির ধারণাকে অনেকটা স্পর্শ করে যায়। যেমন, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেন––মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আর্থিক বা অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য প্রয়োজন। নিঃস্ব নির্ধনের সংস্কৃতিচর্চা চলে না। এই কথা যে যুগবিরোধী তা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলে উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেন না। বরং এই সত্যভাষণ মননজারিত বলে মনে হয় না যখন তিনি বলেন- 'দরিদ্রের পোশাক যেমন ময়লা ছেঁড়া ও স্বল্পমূল্যের, তেমনি দরিদ্রের মানসে-মননে-মনীষায় ও অর্থে কোন সংস্কৃতি-সভ্যতা উন্মেষ বিকাশ লাভ করে না।'[৩৪] এমনকি তিনি যখন শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যকেই সৃজনে-উৎকর্ষে উন্নত সংস্কৃতির দিশারী বলে মন্তব্য করেন তখনও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আহমদ শরীফ প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির কোন রূপে বিশ্বাসী, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কোন্ তত্ত্বে আস্থাবান। আমাদের বিবেচনায়, তিনি বুর্জোয়া বা মার্কসবাদী সংস্কৃতি-ধারণার কোনোটাকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেননি। মূলত আস্থা রেখেছেন ব্যক্তির সৌজন্য, প্রজ্ঞা, সৌন্দর্যপ্রীতি, কল্যাণবাঞ্ছা, সৃজনশীলতায়। সমাজ, তার মতে, ব্যক্তিরই অনুকারক।[৩৫] সংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের এই অবস্থান রেঁনেসাবাহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবতাবাদের ধারণা থেকেই উদ্ভূত, প্রথানুসারী তো বটেই। কারণ

রাষ্ট্রকে সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক-শক্তি জ্ঞান করা শুরু হয়েছে আরও আগেই। বর্তমান ধারণায় সংস্কৃতি সমাজের নানা অসমতাকে চিহ্নিত করে, দ্বান্দ্বিক অবস্থাগুলো বিশ্লেষণ করে, সার্বজনীন সংস্কৃতির ধারণা দেয়।[৩৬] আহমদ শরীফ সার্বজনীন সংস্কৃতির কথা বলেননি, বলেছেন বৈশ্বিক সংস্কৃতির কথা। এর সাথে কিন্তু এর সাথে সার্বজনীন সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য হলো, সংস্কৃতির সার্বজনীনতা 'সমাজের সর্বস্তরের সকল নরনারীর সংস্কৃতি ধর্তব্যের মধ্যে নেয়।'[৩৭]

সংস্কৃতিবান নিরীশ্বরবাদী হওয়াই সঙ্গত। কারণ অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মানুষ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন আহমদ শরীফ।[৩৮] এই বৈশ্বিক সংস্কৃতি একই সাথে বাজার ও যন্ত্রসভ্যতার সৃষ্টি। অতএব আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনা শেষাবধি সর্বমানবিকতা ও শ্রেয়োচেতনাতেই স্থিত; পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী, অদূর ভবিষ্যতে অভিন্ন বৈশ্বিক সংস্কৃতির স্বপ্নাবিষ্ট। বৈশ্বিক সংস্কৃতির একটা প্রভাবশালী ধারা অবশ্য মুক্তবাজার, নব্য-উদারতাবাদ ও আন্তর্জালিক [ইন্টারনেট] জগতের অপ্রতিরোধ্য জারণ-বিজারণের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে প্রতিফলিত। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সাথে প্রকৃতির বা উৎপাদনব্যবস্থার সম্পর্কের ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জগৎকে অধিন্দ্রীয় [ভার্চুয়াল] জগতে প্রতিপালন ও প্রতিপাদনের এক নতুন সংস্কৃতি সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠছে। এর মধ্যে বৈশ্বিক ও সার্বজনীন সংস্কৃতির প্রথাগত ধারণা সংমিশ্রিত হয়ে নতুন রূপ পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুতরাং ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতি, আচরণ-অভিলাষ যেখানে ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে দ্রুত সার্বজনীন হয়ে উঠছে সেখানে বৈশ্বিক বা সার্বজনীন সংস্কৃতির ধারণায় আমূল পরিবর্তনও সময়ের ব্যাপার মাত্র। আহমদ শরীফ কথিত হাজার বছরের বাঙালির 'দ্বৈতাদ্বৈত সংস্কৃতি' কী রূপে বা কতটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সেই অধিন্দ্রীয় জগতে স্থান করে নিতে সক্ষম সে প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার কাল সমাগত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আহমদ কবির সম্পাদিত (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১১ [পরবর্তী উল্লেখ থেকে *আহমদ শরীফ রচনাবলী* সংক্ষেপে *আশর-১* এভাবে ব্যবহৃত হবে।]

২. Simon During, *Cultural Studies : A Critical Introduction* (Oxon : Routledge, 2005), p.7

৩. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি*, তৃতীয় প্রকাশ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০), পৃ. ২৬

৪. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪), পৃ ।

৫. সংখ্যাটি আহমদ শরীফের উল্লেখ থেকে নেয়া। বিস্তারিত- *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১১

৬. আহমদ শরীফ, *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ* (বিদ্যাপ্রকাশ : ঢাকা, ২০১২), পৃ.৪০৮

৭. আরও দেখা যেতে পারে – 'সংস্কৃতি', *আশর*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৪৯

৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২৯

৯. *তদেব*, পৃ.১৩৪

১০. আহমদ শরীফের একই বক্তব্য পাওয়া যায় 'স্বাতন্ত্র্য', 'দেশ জাত ও ধর্ম', 'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর', 'বিশ্বের নাগরিক' প্রবন্ধে।
বিস্তারিত–*আশর*, পূর্বোক্ত।

১১. *তদেব*, পৃ.১৫৩

১২. একই মত- দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ায়মকও নয়। সবকিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে, সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশ-কালের উপযোগী হয়েছে।' – আহমদ শরীফ, 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা', *আশর*, *১ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

১৩. *তদেব*, পৃ. ১৪৬

১৪. *তদেব*, পৃ. ১৪৯

১৫. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৬. *তদেব*, পৃ. ১৪

১৭. তদেব,পৃ. ২৬

১৮. আহমদ শরীফ, *আশর-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬২

২০. *তদেব।*

২১. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২২. *তদেব*, পৃ. ২৭

২৩. *তদেব*, পৃ. ৩২

২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি* (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯), পৃ. ১২

২৫. আহমদ শরীফ, *আশর-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

২৬. *তদেব*, পৃ. ১৫৩

২৭. *তদেব*, পৃ. ৩৬৩

২৮. ফজলুল আলম, *সংস্কৃতিতত্ত্ব ও বাঙালি* (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ১৬২

২৯. আহমদ শরীফ, *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

৩০. আহমদ শরীফ, *আশর*, *৪র্থ খণ্ড* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৩৬৬

৩১. *তদেব*, পৃ. ৩৪৬

৩২. *তদেব*, পৃ. ৩৪৭

৩৩. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৩৪. *তদেব*, পৃ. ২৯

৩৫. তদেব, পৃ. ২৫

৩৬. ফজলুল আলম, পূর্বোক্ত, ১৫৮-১৬১

৩৭. *তদেব*, পৃ. ১৫৮

৩৮. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮